Downloaded from: justpaste.it/Islamic_Renaissance

ইসলামী পুনর্জাগরণ

শহীদ আব্দুল্লাহ ইউসুফ
আযযাম রহঃ

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা আমার,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আজ নূরে তুর্কীর সাম্রাজ্যবাদী বিপ্লব হওয়ার আট বছর আট মাস অতিবাহিত হতে চলছে (শাহীদ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহীমাহুল্লাহ) এই বক্তৃতা ১৯৮৭ সনে প্রদান করেছেন)।

এ দীর্ঘ সময়ে আফগান জাতি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অতুলনীয় কুরবানীর যে নমুনা পেশ করেছেন এবং সর্ব প্রকারের দুঃখ দুর্দশাকে যেভাবে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। তা শুধুমাত্র চেতনাময়ী এক ধর্মপ্রান জাতির কাছেই আশা করা যায়। নিজের ধর্ম ও ইজ্জত আব্রু এবং সম্মানাদী রক্ষার এ যুদ্ধে আজ আফগানের প্রতিটি ঘর শোকালয় ও ইয়াতীম খানায় পরিনত হয়েছে। লাশের পর লাশ মাড়িয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে আফগান জাতি সর্ব দিক থেকে স্বীয় প্রভূর স্বীকৃতি প্রদান করে যাচ্ছে। এখন তুনীরের আর কোন তীর বাকী নেই। এখন ধনুকের রশি ছেড়ার পালা! আফগান জাতি স্বীয় প্রভূর কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার,

সূদীর্ঘ এ সময়ে আফগান জাতির প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে বুকে এ আশা চেপে যে, একদিন না একদিন সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা তাদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসবে। এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আন্তরিক টান তাদেরকে ঘর-বাড়ী, স্ত্রী পুত্রের মায়ার বাধন ছিন্ন করে আফগানে আসতে বাধ্য করবে।

কিন্তু আফসোস, বিশ্ব মুসলিম আজো সেই সকল মজলুম মুসলমানদের আহবানে লাববাইক বলে সাড়া দেয়নি। মজলুমানদের বুক ফাটা আর্তনাদ, অক্ষম ও আহতদের আর্তচিৎকার, ইয়াতীমদের আহাজারি, বৃদ্ধদের মায়াকান্না আজো তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেনি।

তারা বসে আছে অবহেলার পরিচিতি বহন করে। তাদের মধ্য হতে কতিপয় দয়ালু লোকেরা নিজের দস্তরখানের অবশিষ্ট রুটির টুকরা টুকু পাঠিয়ে দিয়েই হাত ঘুটিয়ে বসে আছে আর একেই যথেষ্ট মনে করছে। কিন্তু সমস্যা আরো জটিল ও ভয়াবহ।

আফগানিস্থানে ইসলাম তথা মুসলমানগণ সীমাহীন দুঃখ দুর্দশায় নিমজ্জিত। বাস্তবিকই তারা নানাবিধ ষড়যন্ত্রের শিকার। বর্তমানে এ দৃশ্যমান মোবারক জিহাদ মুষ্টিমেয় যে সকল তরুণ শুরু করেছিল তারা ছিল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নববী আদর্শে উজ্জিবীত উলামায়ে কেরামদের এক জামাত। যারা স্বীয় জীবন আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল তারাই জিহাদকে এ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রজন্মের সেই কাফেলার অনেকেই শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে প্রভূর সাথে মিলিত হয়েছেন।

তাদের এ শুন্যতা পূরনার্থে দ্বিতীয় আরেকটি প্রজন্ম সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, একে তো এ প্রজন্মের লোকেরা নিজেরা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, এমনকি এদিক সেদিক থেকেও তাদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে কোন হৃদয়বানের সহযোগীতার হাত প্রসারিত হয়নি। অথচ তাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন যে, কোন আলেমে রাববানী তাদের মাঝে থাকবে। এবং প্রথমেই তাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়ে দেবে, অতঃপর তাদেরকে শারীয়াতের বিধি বিধান শিখাবে।

বর্ণিত চিত্র হতে স্বল্প অভিজ্ঞতা ও যৎসামান্য বিদ্যার আলোকে আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, বর্তমান আফগানিস্তানের এ করুন পরিস্থিতিতে সমস্ত উলামায়ে কেরাম, মুফাসসীরীন, মুহাদ্দিসীন, উসুলিয়্যিন এমনকি চার মাযহাবের ফোকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতের ফাতোয়া এই যে, আফগানিস্তানে নিজের জান মাল দিয়ে জিহাদ করা ফারজে আইন।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহীমাহুল্লাহ) আল-ফাতোয়া আল-কুবরা এর চতুর্থ ভলিয়মের ৬০৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, *"যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্র শত্রুর আক্রমনের শিকার হয় তবে এর মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শত্রুর মোকাবেলা করা নিকটতম। অধিবাসীদের উপর ওয়াজিব (যদি তারা মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয় তবে তার নিকটবর্তী অধিবাসীদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়)। কেননা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্রের মতো, এমতাবস্থায় সন্মান তার পিতা-মাতার, ঋনগ্রস্থ ঋনদাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বের হওয়া ফারজ এবং ওয়াজিব হয়ে যায়।"*

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রহীমাহুল্লাহ) যা কিছু লিখেছেন তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি মাজমুয়া আল-ফাতাওয়া এর ২৮ তম ভলিয়মের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, "যদি শত্রু কোন মুসলিম এলাকায় আক্রমন করে তবে সেই এলাকার সকল পুরুষের উপর জিহাদ করা তাৎক্ষনিক ওয়াজিব হয়ে যায়। সেই এলাকা ছাড়া অন্য এলাকার আধিবাসীদেরও একই হুকুম। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"যদি তারা তোমাদের কাছে সহযোগীতা কামনা করে তবে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে সহযোগীতা করা।" সূরা-তাত্ তাওবা।

যেমনিভাবে রসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদেরকে সাহায্য করার আদেশ করেছেন।

জিহাদের এ গুরুত্বপূর্ন কাজ চাই কেহ বেতন নিয়ে করুক, চাই কেহ স্বেচ্ছায় বিনা বেতনে ময়দানে অবতীর্ন হয়ে করুক, এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এ সু-মহান কাজ প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী আনজাম দিতে হবে।

খন্দকের যুদ্ধের সময় শত্রুরা পরিখা খনন করে যখনি আক্রমনের ইচ্ছাপোষন করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতির অনুমতি বন্ধ করেছেন। "

এ প্রসঙ্গে ফোকাহায়ে আরবগণ যা কিছু লিখেছেন তাও সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কোন প্রকার তা'বীল বা পরিবর্তনের আবকাশ নেই।

ইবনু আবেদীন হানাফী তিনি স্বীয় ব্যাখ্যার তৃতীয় ভলিয়মের ২৩৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, "ইসলামী দেশের সীমান্তে যদি কোন শত্রু আক্রমন করে তবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের উপর জিহাদ ফারজে আইন হয়ে যায়। আর যারা সে এলাকা থেকে দূরে এবং জিহাদে যদি তাদের সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন না পড়ে তবে তাদের জন্যে জিহাদ ফারজে কিফায়া। যদি শত্রু কবলিত এলাকার অধিবাসীরা শত্রুর মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় বা অলসতা প্রদর্শন করে, এমতাবস্থায় যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরও জিহাদ ফারজে আইন হয়ে যায়। এর রূপ ফরজ হয়ে যায় যা, নামাজ রোজার মত ত্যাগ করা যায় না। অতঃপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরাও যদি মোকাবেলা করতে না পারে তবে এ ফারজে আইন তার পার্শ্ববর্তীদের উপর স্থানান্তরিত হবে, অতঃপর তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতি, এভাবে পর্যায় ক্রমে এক সময় জিহাদ পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তের সকল মুসলমানদের উপর ফারজে আইন হয়ে যায়।

এমনিভাবে সু-স্পষ্টাক্ষরে "বাদাঈ আসসানাঈ" এর সপ্তম ভলিয়মের ৭২ নং পৃষ্ঠায় ইমাম কাসানী আল হানাফীর, "আল-বাহরুর রায়েক" কিতাবের ৫ম ভলিয়মের ৭২ নং পৃষ্ঠায় ইবনু নাজমুল হানাফীর এবং আল-ফাতহুল ক্বাদীর এর ৫ম ভলিয়মের ১৯১নং পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনুল হুমাম (রহীমাহুল্লাহ) এর ফাতাওয়া লিখিত আছে।

হয়তবা কিছু সংখ্যক লোক আফগানীদের অধিকাংশের মাঝে ইসলামী শিক্ষার উজ্জলতা না দেখতে পেয়ে নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে এবং তাদের মাঝে বিরাজমান কতিপয় মতানৈক্য নিজেদের বসে থাকার কারন হিসাবে যথেষ্ট মনে করছে। এর উত্তর উলামায়ে কেরাম এভাবে দিয়েছেন যে, জিহাদ চাই ফাসিক এবং ফাজিরের সাথে করতে হয় তথাপিও জিহাদ করা এমন ওয়াজিব যে তা থেকে ক্ষণিকের তরেও মুখ ফিরানো সম্ভব নয়।

এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্ম পদ্ধতি। প্রয়োজনে জিহাদ প্রত্যেক শ্রেনীর লোকের সাথে মিলে মিশে করতে হয়। কেননা অনেক সময় আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের সহযোগীতা ফাসিক লোক ও চরিত্রহীন জাতির দ্বারাও নিয়ে

থাকেন। এ পদ্ধতিই এ জাতির উত্তম লোকদের থেকে সদা সর্বদা চলে আসছে। এ পদ্ধতি আজো প্রত্যেক বিবেকবানের উপর ওয়াজিব।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, জিহাদের আমীরদের সাথে মোকাবিলা করা উচিত নয়, চাই সে ফাসিক ফাজির হোক না কেন এবং ইসলামী ক্যাম্পের পক্ষ থেকে লড়াই কারী সৈনিকদের সাথেও ঝগড়া বিবাদ করা উচিৎ নয়, চাই তাদের মাঝে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পাওয়া যাক। কেননা পরস্পরের বিবাদ এটা মূলত খারেজীদের একটি গ্রুপ ''পারুরিয়াদের'' মতাদর্শ।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহীমাহুল্লাহ) এর ''মাজমুউল ফাতাওয়া'' এর ২৮ নং খন্ডের ৫০৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি কম ইলমের কারণে ধ্বংসাত্বক তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, জিহাদে তাকেও সঙ্গ দিতে হবে এবং স্বল্প বিদ্যান, মূর্খ নিজের ঈমান ধ্বংসকারী ও যদি আল্লাহ ভীরুতার সাথে জিহাদে আগমন করে তবে তাকেও পরিপূর্ন ভাবে সঙ্গ দিতে হবে।

কিছু লোক এ উজর পেশ করে যে, তা'লীম তরবীয়্যাতের জন্যে নিজ শহরে থাকার কোনো বিকল্প নেই। তাদের এ কথার প্রতি উত্তরে আমরা ইমাম যুহরী (রহীমাহুল্লাহ) এর বানী পেশ করছি।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহীমাহুল্লাহ) তিনি জিহাদের জন্যে বেরিয়েছেন, অথচ তার একটি চোখ ইতিপূর্বে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে। তাকে বলা হল, আপনিতো অসুস্থ ও অক্ষম, আপনি আরাম করুন, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এবং সকলকেই লড়াই করার আদেশ করেছেন, আমি যদি লড়াই নাও করতে পারি তবে মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং তাদের রসদপত্র সংরক্ষন করতে তো পারব?

যদি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব এর কর্ম পদ্ধতি এমন হয়, তবে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা আমাদের মুক্তির জন্যে কোন পথ অবলম্বন করব।

হে আল্লাহ ওয়ালা সম্প্রদায়,

ষড়যন্ত্রের পানি কোমর অতিক্রম করে গর্দান পর্যন্ত বৃদ্ধি হচ্ছে এবং মুসলমানদের আচার আচরন প্রতিনিয়ত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এমতাবস্থায়ও যদি নফীরে আম ওয়াজিব না হয়, তবে আর কবে হবে, এবং নিশ্চিন্তে বহমান এ পানি কতকাল পর্যন্ত বইতে থাকবে, কারো জানা আছে কি?.....

যদি সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ফাতাওয়া প্রদান করতেন, (যেমনটি বাজাযিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে) ''কোন মুসলিম রমনী পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে যদি বন্দি হয়, তবে পশ্চিম দিগন্তের মুসলমানদের উপর ফরজ হচ্ছে সেই বন্দি রমনীকে মুক্ত করা।''

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের আলিম সমাজ ঐ সকল হাজার হাজার নারীদের সম্পর্কে কি ফাতাওয়া দিবেন? যাদের সতীত্বহানীর জন্যে শত্রুর বন্দিশালায় প্রতিদিন নিলাম করা হয়। তবে তারা সে নারীদের ব্যাপারে কি জবাব দিবেন, যারা লাল ফৌজের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া থেকে মুক্তির আশায় কুনার এবং লগমান এর সমুদ্রে ঝাপ দিচ্ছে। কেননা নারীদের জন্যে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ফাতাওয়া এটা যে, নিজের আত্ম সম্ভ্রম হারানোর আশংকায় তাদের জন্যে কোন ভাবেই জায়েজ নেই যে, তারা নিজেদেরকে শত্রুদের হস্তগত করবে।

তারা কি এ কথা ভাবেনা যে, এ মুসিবত ভবিষ্যতে তাদেরকেও গ্রাস করতে পারে এবং এ সমস্যা তাদেরও মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাড়াতে পারে।

আবু দাউদ (রহীমাহুল্লাহ) তার সহীহুল জামির ৫৫৬৬ নং পৃষ্ঠায় হযরত জাবির (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমতাবস্তায় অপমানিত করে যে, যেখানে তার সম্মান বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়। তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাকে ঐ স্থানে অপমানিত করবেন, যেখানে তার কামনা হবে যে কেহ তাকে সাহায্য করুক।"

আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমতাবস্তায় সাহায্য করবে যেথায় তার ইজ্জত, সম্মান ও স্বাধীনতা নিয়ে ছিনি মিনি খেলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেখানে সাহায্য করবেন, যেখানে তার আকাংখা হবে যে, কেহ তাকে সাহায্য করুক।

হে ঘুমন্ত মুসলমান!

নিজের ইজ্জতের খেয়াল কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। হাববান ইবনু মুসা বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহীমাহুল্লাহ) এর সাথে শামের সীমান্ত পাহারাদারীর জন্যে বের হয়েছি, যখন ইবনু মুবারক (রহীমাহুল্লাহ) দেখলেন যে, সওয়াবের আশায় জিহাদের ময়দানে মানুষ দলে দলে আগমন করছে। তখন আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, **"আমি আমার সারা জীবন এবং জীবনের সমস্ত দিন রাত শিক্ষা দিক্ষায় অতিবাহিত করেছি অথচ এখানে জান্নাতের দরজা খোলা রাখা হয়েছে।"**

তিনি সেই ইবনু মুবারক, যিনি প্রতিবছর দুই মাস অথবা তার অধিক সময়ের জন্যে নিজের ব্যবসা বানিজ্য এবং দরসে হাদীসের শ্রোতধারাকে বন্ধ রেখে সীমান্ত রক্ষা ও পাহারাদারীর জন্যে বের হতেন। এতদসত্বেও তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, "আফসোস! আমি সারাটা জনম পাহারাদারী করতে পারলাম না, ইলম ও তা'লীমের কাজ আমাকে এ মহান সওয়াব থেকে বঞ্চিত সেখেছে।"

এখন ঐ সকল লোক কি বলবে যারা সারা জীবনে আল্লাহর রাস্তায় একটি গুলিও চালায়নি। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তথাপিও তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে স্বরণ করিয়ে দিতে ভুল করেননি যে, "উসামার বাহিনীকে প্রেরন কর"।

অতঃপর যখন আবু বকর সিদ্দীক (রাদিআল্লাহু আনহু) উসামার বাহিনীকে প্রেরন করার ইচ্ছা পোষন করলেন, তখন কতিফয় সাহাবী (রাদিআল্লাহু আনহু) তাকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়নে বাধা দিতে চাইলেন। তখন তিনি সেই প্রসিদ্ধ বানী আবৃত্তি করলেনঃ-

ঐ সত্তার শপথ! যিনি ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেহ নেই "কুকুর যদি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহ ধর্মীনিদের পা টানতে থাকে" তথাপিও আমি ঐ বাহিনীকে বাধা দিব না যাতে স্বয়ং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরন করার আদেশ করেছেন এবং সেই পতাকাও খুলব না, যা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে উসামার হাতে অর্পন করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা ১ম বলিয়ম ৪৪০ পৃঃ)

আল্লাহর কি করুনা যে, তিনি চাইলেন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বন্ধুর সর্বশেষ অসিয়তও মানুষদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রানিত করার ব্যাপারে হোক। যখন হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) অন্তিম মুহূর্তে শায়িত, তখন হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) কে ডেকে বললেন, উমর শোন! আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, যার উপর তৎক্ষনাৎ আমল করা আমার একান্ত কামনা। আমি অদ্য সোমবার দিনেই মারা যাব, অতএব আমার মৃত্যু সত্বেও তুমি সন্ধার পূর্বেই মানুষদেরকে মুসান্না (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সাথে যাওয়ার জন্য আদেশ করবে। কবরদার সকালের অপেক্ষা করোনা এবং ভালভাবে লক্ষ্য রেখো কোন বিশাল মুসিবতও যেন তোমাকে দ্বীনের এ সু-মহান কাজ ও প্রভুর হুকুম পালন থেকে বিরত রাখতে না পারে।

তুমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তিরোধানের সময় আমাকে দেখেছ, সে সময় আমি যা কিছু করেছিলাম তুমিও তার সাক্ষক্ষ, যদিও মানুষের জন্যে এর চেয়ে বড় আর কোন দুর্ঘটনা হতে পারেনা। কিন্তু যদি আমি আল্লাহ ও তার রসূলের হুকুমে সামান্যতম অবহেলা ও বিলম্ব করতাম, তাহলে আমার আশংকা ছিল যে, না জানি আল্লাহ আমাদের অপমানিত করেছেন এবং আমাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। সুতরাং আমি সেই দিনই মার্চ করার আদেশ করলাম ফলে রাত্রির অন্ধকারে মদীনার অলি গলি কাফেলার মশালের আলোতে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর উপর রহম করুন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তিনিই সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন। তিনি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে জিহাদ "নফীরে আম" ঘোষনার পর ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ভ করার ফলাফল ক্ষতি, লাঞ্চনা ও অপদস্থতা বিনে আর কিছুই হতে পারে না।

হে মুসলিম ভাইয়েরা আমার!

এটাই হচ্ছে কিতাবুল্লাহর বিধান এবং এটাই হল রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সফলতার শ্রোত ধারা। যা তারা জিহাদের এই আজিমুশ্বান পথ অবলম্বনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন।

এ সকল অগনিত সুস্পষ্ট, ক্রমাগত, আলোকময় অকাট্য সু-মহান উদাহরনের পরও কি আমাদের জন্যে কোন পলায়নের পথ বাকী আছে? শত্রু মু'মীনা নারীর লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌছেছে, আমরা কি তাকে এভাবে ইজ্জত নিয়ে খেলতে, নিয়ম শৃংখলার কিয়ামাত ঘটাতে ও দ্বীন ইসলামের মূলোৎপাটন করতে ছেড়ে দিব?

বন্ধুরা আমার,

রুশিরা ২৫ লাখ আফগানী মুসলমান শিশুকে সামন্তবাদী মতবাদ শিক্ষা দেয়ার জন্যে এবং তাদের কোমল হৃদয়ে নাস্তিক্যবাদের বীজ বপন করার জন্যে রাশিয়ায় নিয়ে গেছে। ঐ দিকে মার্কিনীরা ৬০০ মাদ্রাসা খুলে ১৫ লাখ ছাত্রদের তাদের ধাচে শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিল (রেজুলেশন) পাশ করেছে। আমার জিজ্ঞাসা, ইসলামের দায়ীরা আজ কোথায়? এবং ইসলামের প্রশিক্ষন প্রদানকারী মু'আলিম্নমগন কোথায়? এবং তারা এ সকল মুসলিম প্রজন্মকে রক্ষা করতে এবং সু-মহান ও বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহন করতে, কি প্রস্তুতি গ্রহন করেছেন? ফোকাহায়ে কেরামগন তাদের কিতাবে লিখে গেছেন যে, সমস্ত মুসলিম দেশ একটি দেশের ন্যায়। যদি মুসলমানদের কোন এলাকায় শত্রু আক্রমনের আশংকা থাকে, তবে তৎক্ষনাৎ ওয়াজিব হয়ে যায় যে সমস্ত উম্মতে ইসলামিয়া তাকে শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্যে ঝাu ঁপয়ে পড়বে। এরপরও উলামায়ে কেরামদের কি হল যে, তারা যুবকদেরকে জিহাদের জন্যে অনুপ্রানিত করছে না? বিশেষ করে এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে যখন জিহাদে অংশগ্রহন করা ফারজ।

মু'মীনদের উৎসাহ প্রদান কর-

দায়ীদের কি হল যে তারা তাদের জীবনের এক দুই বছর মুজাহিদদের মাঝে অতিবাহিত করছে না? যেন তারা মুজাহিদদের সাথে থেকে তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করে।

ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের কি হল যে, তারা জিহাদের সু-মহান সম্মান লাভের জন্যে ও পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষক্ষ্য, স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহনের জন্যে তাদের শিক্ষাকে এক বছরের জন্য মূলতবী করছে না?

তারা পিছনে পড়া লোকদের সাথে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মহর দেয়া হয়েছে তাদের অন্তর সমূহের উপর। বস্তুর তারা বুঝেনা। কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মাল দ্বারা। তাদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে কল্যান সমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষক্ষ্য উপনীত হয়েছে। (তাওবা-৮৭)

ঈমাম সাহেবদের এবং ওলামাদের কি হয়েছে যে, যে সকল মানুষ তাদের কাছে পরামর্শ এবং উপদেশ লাভের জন্যে আসে, তারা তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত করার উদ্দেশ্যে তনু-মন দিয়ে জিহাদ করার উপদেশ করেনা?

জাতির কর্নদার, ঈমানের আলোতে ঝলসে উঠা মু'মীন যুবকেরা "দুর্বল ঈমানের" খোড়া অজুহাত পেশ করে আর কতকাল জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকবে?

সেই যুব সমাজ, যাদের অন্তর জিহাদের প্রেমে পাগলপারা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে ফেটে পড়ে এবং চেতনার আগুনে জ্বলে পুড়ছে। তারা কি মুসলমানদের প্রিয়ভূমিকে নিজের পবিত্র লহুতে সিক্ত করার জন্যে কোনদিন ময়দানে অবতীর্ন হবে?

সেই শুভ দিনটি কবে আসবে?....

এই উম্মাতের যদি সমাজকে জিহাদ থেকে বাধা দান কারীরা জেনে রেখ এ গৌরবময় কাজে এবং কাউকে নামাজ বা রোজা থেকে বাধা প্রদান করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

জিহাদ থেকে বাধা দান কারীরা কি এটা ভয় করেনা যে, তারা এর মাধ্যমে সরাসরি ঐ আয়াতের আওতায় এসে যাচ্ছেঃ-

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নামাজ রত কোন বান্দাকে নামাজ পড়তে বাধা প্রদান করে?

মায়েদের কি হয়েছে যে, তারা তাদের এক একজন ছেলেকে আল্লাহর পথে পাঠাচ্ছেনা? যা কিনা তাদের জন্যে দুনিয়াতে সম্মান ও পরকালে সুপারিশের মাধ্যমে হবে।

পিতাদের কি হয়েছে যে, তারা নিজের এক একজন ছেলেকে বীরপুরুষ তৈরীর কারখানায়, বাহাদুর তৈরীর ময়দানে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জওয়ান হওয়ার জন্যে পাঠাচ্ছেনা।

মায়েদের ভাবা উচিৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদেরকে বন্ধা করে দিতেন তবে?... নিয়ামাতের শুকরিয়ার দাবি এটাই যে, সেই নিয়ামাত ছিনিয়ে নেয়ার পূর্বেই নিজেদের ছেলেদের যাকাত আদায় করবে।

পিতাদের ভাবা উচিৎ যে, ছেলেদের কি তারা নিজেদের শক্তি বলে জন্ম দিয়েছে? এবং তাদেরকে খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির দাতা কি সে নিজেই? যদি এমনটি না হয়? তবে আল্লাহ রাববুল আলামীনের সাথে কৃপনতা কিভাবে সাজে?

সম্পদের মালিকের সাথেও কি কৃপনতা?

আর এটাই কি তোমার আত্মবিশ্বাস?

কোন জীবই নিজের আল্লাহ প্রদত্ত বয়স এবং রিযিক পূর্ন করা ব্যতিত মরতে পারেনা।

মুসলমানদের কি হয়েছে যে, তারা নিজেদের আমলের খাতায় এবং নেকীর খাতায় পাহারাদারীর একদিন বা কিতালের এক ঘন্টা সময় লেখানোর জন্যে কেন দৌড়ায় না।

অথচ হাদীস শরীফে এসেছেঃ

"একদিন আল্লাহর পথে পাহারা দেয়া একাধারে একমাস রোজা রাখা এবং রাত্রে দাড়িয়ে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।"

অপর একটি ছহীহ হাদীসে আছে ঃঃ

"আল্লাহর পথে একদিন পাহারা দেয়া, এমন এক হাজার দিন, যার রাত্রিগুলো দাড়িয়ে নামাজ রত অবস্থায় এবং দিনগুলো রোজার মাধ্যমে কেটেছে তার চেয়েও উত্তম।"

ইমাম আহমাদ (রহীমাহুল্লাহ) এবং তিরমিযী (রহীমাহুল্লাহ) "ছহীহুল জামি" এর ৪৫০৩ পৃষ্ঠায় একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অর্থঃ- "যুদ্ধের জন্যে এক ঘন্টা সময় কাতারে দাড়ানো, ষাট বৎসর দাড়িয়ে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা আমার,

জাগো-গভীর নিদ্রা হতে জাগো, দ্বীনের হিফাজাতের জন্যে ও প্রভুর নুসরাত এবং প্রিয় নাবীর সুন্নত কে যিন্দা করার জন্যে জাগো। নিজের তরবারীর চমক দেখাও এবং স্বীয় ঘোড়ার হ্রেষ ধ্বনিকে বৃদ্ধি কর ও স্বীয় জাতির গায়ে লাগা অপমানিত্বের দাগকে ধুয়ে ফেল।

তোমরা যদি নাহি জাগো হে বীর

তবে আর কে আছে করবে উঁচু শীর।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

তাদের কাহিনীতে নিহিত আছে জ্ঞানীদের নসিহত। রক্তে স্নাত বুখারার কাহিনী, আহত ফিলিস্তিনির গল্প, প্রজ্জলিত আদনের খবর এবং কয়েদীদের করুন আর্তি, দুঃখ বেদনায় নিমজ্জিত স্পেনের আলোচনা আমাদের জন্যে সর্বোত্তম নসিহত। আমরা কি হাত থেকে সময় চলে যাওয়ার পূর্বেই অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহন করবো না?

আমরা কি হাতে হাত রেখে বসে বসে কাল বিবর্তনের অপেক্ষা করব? সময়তো চলেই যাবে, সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করবেনা। তাই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেঃ

আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সময়ের লাগাম ধরার দুঃসাহস করব নাকি লাঞ্চনা ও অপমানের বোঝা বহন করে করে যমীনের অতরে ধ্বসে যাব? নাকি জিহাদের এই আজীমুশ্বান আলোড়ন সত্তের সকল হতভাগা ও কপাল পোড়াদের সাথে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ ভাবেই হারিয়ে যাব? যেমনিভাবে পূর্বের অনেক জাতি ইতিহাসের আস্তাকুরে নিক্ষক্ষপ্ত হয়েছে।

আবু দাউদ (রহীমাহুল্লাহ) হযরত আবু উসামা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেনঃ-

যে নিজে জিহাদে অংশগ্রহন করেনি এবং কোন গাজীর পরিবার পরিজনের (তার অনুপস্থিতিতে) খবরা খবর নেইনি, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামাতের পূর্বেই কঠিন বিপদের সম্মুখীন করবেন।

নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে অথবা যে নিবিষ্ট মনে তা শ্রবন করে। এবং অবশ্যই সে সাক্ষ্য দেয়ারও ক্ষমতা রাখে।

আমি কি দাওয়া পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষক্ষ থেকো

আমি কি দাওয়া পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষক্ষ থেকো

আমি কি দাওয়া পৌছিয়েছি? হে আল্লাহ! তুমি স্বাক্ষক্ষ থেকো

[বিঃদ্রঃ এই খুতবাহটি শাইখ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ১৯৮৭ সালে দিয়েছিলেন।]